সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী: প্রেক্ষাপট, বিষয়বস্তু এবং পর্যালোচনা

মোঃ হেলাল উদ্দিন

[1] *Md. Helaluddin is a Lecturer in Political Scienc (O.S.D, Department of Secondery and Higher education) and Fellow of National university, Bangladesh. e-mail: hehelaluddin565@gmail.com*

Abstract

A state is governed on the basis of certain principles, the sum of these principles is called the constitution. Amendment of the constitution may be necessary for the welfare of the people of the state. Seventeen amendments have been made in the constitution of Bangladesh so far. One of the important ones is the Fifteenth Amendment. Because through this amendment, the original spirit of the constitution is returned to the basic principles of 1972's constitution. In addition, the caretaker government system was abolished, some articles of the constitution were made ineligible for amendment, blocking the way of illegal power grab, Bangabandhu was constitutionally recognized as the father of the nation, the speech of 7th March was included as a shedule in the constitution and several articles amendment were brought. Although the constitution has been given a beautiful shape through the fifteenth amendment, there are controversy over some other issues including the amendment process, the abolition of the caretaker government system and some articles also barred the possibility of amendment by any subsequent government or parliament. All these reasons make the Fifteenth Amendment of special importance.

Key Words: রাষ্ট্র, ক্ষমতা, সংবিধান, সংবিধান সংশোধন ও পঞ্চদশ সংশোধনী

ভূমিকা

দীর্ঘ নয় মাসের এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের এক বছরের মধ্যে দেশের জন্য সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। যা ৪ নভেম্বর, ১৯৭২ সালে গণপরিষদে পাশ হয়ে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসের প্রথম বার্ষিকী থেকে কার্যকর হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের পর এখন পর্যন্ত ১৭ বার সংশোধনী আনা হয়েছে। যার মধ্যে ২০১১ সালের পঞ্চদশ সংশোধনী এক বিশেষ গুরুত্ব বহন করে, কেননা পূর্ববর্তী ১৪ টি সংশোধনীর কোনটিতেই সাধারণ জনগণের মতামত নেয়া হয়নি। কিন্তু পঞ্চদশ সংশোধনীতে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের মতামত নেয়া হয়েছে। এছাড়াও আরো কতিপয় কারণে পঞ্চদশ সংশোধনীর গুরুত্ব রয়েছে। যে কারণ হিসাবে বলা যায়, এই সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি বাতিল করা, বাহাত্তরের সংবিধানের চার মূলনীতিতে ফেরত যাওয়া, সংবিধানের কতিপয় অনুচ্ছেদ সংশোধনের অযোগ্য বলে ঘোষণা, শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতা হিসাবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়া, ৭ মার্চের ভাষণকে সংবিধানের তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করণসহ গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনা হয়।

পঞ্চদশ সংশোধনী যেমন নানান কারণে বাংলাদেশের সাংবিধানিক ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে, তেমনি এই সংশোধনী নিয়ে বিতর্কেরও শেষ নেই। বিশেষ করে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ছাড়াও সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ, কতিপয় অনুচ্ছেদ পরবর্তী কোন সংসদ সংশোধন করতে না পারাসহ পঞ্চদশ সংশোধনী প্রক্রিয়ায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ না করেই শুধু বিরোধীতা করা এবং সংবিধানের মৌলিক কাঠামোতে পরিবর্তন আনা হলেও তা গণভোটে না পাঠানো নিয়ে বিতর্ক রয়ে গেছে। তাই বর্তমান প্রবন্ধটিতে পঞ্চদশ সংশোধনীর প্রেক্ষাপট ও সংশোধনী পর্যালোচনা করে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর আলোচনা-তর্ক-বিতর্ক তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

গবেষণাকর্মটির মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর প্রেক্ষাপট, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু এবং তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশের সাংবিধানিক উন্নয়নের একটি সাধারণ ধারণা লাভ করা। এছাড়া বিশেষ উদ্দেশ্য সমূহ হলো-

ক) বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করা;
খ) পঞ্চদশ সংশোধনীর লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু চিহ্নিত করা;
গ) পঞ্চদশ সংশোধনীর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে সাংবিধানিক উন্নয়নের ধারণা লাভ করা।

গবেষণা পদ্ধতি ও তথ্যসংগ্রহ

গবেষণাকর্মটি প্রকৃতিগতভাবে গুণগত ও অনুসন্ধানমূলক। এটি মূলত দালিলিক বিশ্লেষণের (Document analysis) উপর ভিত্তি করে একটি গবেষণা। তাই এক্ষেত্রে (ক) পর্যবেক্ষণমূলক (Observation study), (খ) ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ (Historical analysis) এবং (গ) মূল আধেয় (Content analysis) কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যেহেতু গবেষণাকর্মটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মাধ্যমিক তথ্য বিশ্লেষণের দাবী রাখে তাই তথ্য সংগ্রহের প্রধান দুইটি উৎস - প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণায় ব্যবহৃত উল্লেখ্যযোগ্য দলিলসমূহের মধ্যে রয়েছে- বাংলাদেশ সংবিধান, বাংলাদেশের সরকার, রাজনীতি ও সংবিধান বিশেষজ্ঞের গবেষণাধর্মী বই, প্রকাশিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ, ইন্টারনেট ও পত্রপত্রিকা এবং প্রকাশিত গ্রন্থাবলি।

সংবিধান ও সংবিধান সংশোধন: তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত

রাষ্ট্র হলো একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যা কতিপয় ব্যক্তির সমন্বয়ে পরিচালিত হয়, যাকে সরকার বলা হয়ে থাকে। আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ নিয়ে সরকার। সরকার পরিচালনার জন্য প্রতিটি দেশের রয়েছে নির্দিষ্ট কিছু নীতিমালা, যার অধীনে একটি রাষ্ট্র পরিচালিত হয়ে থাকে। এই নীতিমালার সমষ্টিকে বলা হয় সংবিধান।[১]

নিজ রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রতিটি রাষ্ট্রের রয়েছে রাষ্ট্র তথা সরকার পরিচালনার আলাদা আলাদা বিধানাবলী। প্রতিটি রাষ্ট্র তাদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, ভৌগোলিক ও অন্যান্য বিষয়াবলীর পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সংবিধান রচনা করে থাকে। যার ভিত্তিতে সেই রাষ্ট্র পরিচালিত হয়ে থাকে।[২]

একটা রাষ্ট্রের ক্ষমতা ঐ রাষ্ট্রের বিভিন্ন মৌলিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিভাজিত থাকে। রাষ্ট্রের অঙ্গসমূহ ক্ষমতার একটা অংশ ভোগ করে থাকে। তাই কোন প্রতিষ্ঠান যদি ক্ষমতা বেশি ভোগ করে তাহলে অন্য প্রতিষ্ঠানকে সমপরিমাণ ক্ষমতা কম ভোগ করতে হবে। এজন্যই ক্ষমতার বন্টন এবং কর্মের পরিধি নির্ধারণেও সংবিধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই Gilchrist সংবিধানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'Constitution is that body of rules or laws, written or unwritten which determine the organization of Government, the distribution of powers of various organs of Government and the general principles on which these powers are exercised.'[৩]

সংবিধান নিয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও লেখকের প্রদত্ত সংজ্ঞা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বলা যায়, সংবিধান হলো একটি নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট নীতিমালার সমষ্টি যেখানে সরকার ও সরকারের বিভিন্ন বিভাগের গঠন ও পরিচালনা এবং ক্ষমতার বন্টন, শাসক ও শাসিতের মধ্যকার সম্পর্ক, অধিকার এবং দায়িত্বের সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া হয়। মোটকথা, সংবিধান হলো একটা রাষ্ট্রের প্রাণ এবং রাষ্ট্র পরিচালনার দর্পণ।

পরিবর্তনশীল সমাজের সাথে সামঞ্জস্য রেখে রাজনীতিরও পরিবর্তন ঘটে। তাই রাজনীতির পরিবর্তন ও প্রগতির সাথে সংবিধানের প্রয়োজনীয় পরিবর্তনও আবশ্যক হয়ে যায়। সংবিধানকে গতিশীল ও জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতি নিষ্ঠা রাখতেই সংবিধান সংশোধন করা হয়ে থাকে। সাধারণত সংশোধনী বলতে একটি আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় যে কোন চুক্তি, আইন, সংবিধান বা অন্য যেকোন আইনগত নথির কোন ধরনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন কিংবা বিয়োজনকে বুঝায়। অন্যভাবে বলা যায়, সংশোধন হলো একটি আইনি দলিলে এমন পরিবর্তন যেখানে কোন নির্দিষ্ট অংশের পরিবর্তন, সংযোজন বা বিয়োজন করা হয়। সঠিক পদ্ধতিতে সংশোধিত আইন বা আইনগত নথি কার্যকর হলে মূল আইনের বা আইনগত নথির বৈধতা বজায় থাকে।[৪]

সংবিধান সংশোধনীর বিষয়ে বিচারপতি Shahabuddin Ahmed বলেন, 'the term amendment is a change or alteration, for the purpose of bringing improvement in the statute to make it more effective and meaningful, but it does not mean its abrogation or destruction or a change resulting in the loss of its original identity and character.'[৫]

মোটকথা, সংবিধান সংশোধন বলতে সংবিধানের বিদ্যমান বিধি-বিধানের আনুষ্ঠানিক পরিবর্তনকে বুঝায়। এই পরিবর্তনের মাধ্যমে সংবিধানের কোন ধারার পরিবর্তন, নতুন কোন ধারা-উপধারা সংযোজন কিংবা কোন ধারার বাতিল করা হয়ে থাকে।

সংবিধান সংশোধন করতে গিয়ে সংবিধানকে সংসদীয় প্রাধান্য এবং সাংবিধানিক প্রাধান্য এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যেখানে সংসদীয় প্রাধান্য বলতে বুঝায় সংবিধানের উপর আইনসভার কর্তৃত্ব বিদ্যমান এবং আইনসভা সংবিধানের যে কোন ধরনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন কিংবা রহিতকরণ তথা যে কোন ধরনের সংশোধন করতে সক্ষম। এই ধরনের সংসদীয় প্রাধান্য অলিখিত এবং নমনীয় বা সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা ব্রিটিশ সংবিধান পদ্ধতিতে আমরা দেখতে পাই। সংসদীয় প্রাধান্যের ক্ষেত্রে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়- এক. রাষ্ট্রে এমন কোন আইন নেই যা আইনসভা পরিবর্তন বা সংশোধন কতে পারে না, দুই. সাধারণ আইন এবং সাংবিধানিক আইনের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই এবং তিন. কোন প্রতিষ্ঠানই আইনসভা কর্তৃক প্রণীত কোন আইনকে অবৈধ বা অসাংবিধানিক ঘোষণা করতে পারে না। অন্যদিকে, সাংবিধানিক প্রাধান্য বলতে বুঝায় সংবিধান আইনসভার উপর কর্তৃত্ব সম্পন্ন এবং আইনসভা সংবিধান নির্দেশিত নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মের মধ্যে থেকে তার কার্যাবলী সম্পন্ন করে থাকে। এই সাংবিধানিক প্রাধান্য লিখিত এবং অনমনীয় বা দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান। মোটকথা, সংবিধান

সংশোধনের ক্ষেত্রে লিখিত সংবিধান নমনীয় হতে পারবে না, এখানে সাংবিধানিক প্রাধান্য বিদ্যমান থাকবে এবং অলিখিত সংবিধানে সংসদীয় প্রাধান্য থাকবে।[৬]

বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধন প্রক্রিয়া

সংবিধানের মাধ্যমে একটি দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকাশ পায়। সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতি পরিবর্তনশীল তাই রাষ্ট্রের সংবিধানও পরির্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধন হতে পারে। যাকে সংবিধানের ভাষায় বলা হয়ে থাকে সংশোধনী। প্রতিটি দেশের সংবিধানেই এর সংশোধনীর বিধান থাকে। বাংলাদেশের সংবিধানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে সংবিধান সংশোধনীর বিধান উল্লেখ আছে। এছাড়া জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ৯৯ ধারায় সংবিধান সংশোধনের কথা বলা হয়েছে।

সংবিধানের ভাষ্য মতে, এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও-

(ক) সংসদের আইন-দ্বারা এই সংবিধানের কোন বিধান সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণের দ্বারা সংশোধিত হইতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে,

(অ) অনুরুপ সংশোধনীর জন্য আনীত কোন বিলের সম্পূর্ণ শিরোনামায় এই সংবিধানের কোন বিধান সংশোধন করা হইবে বলিয়া স্পষ্টরূপে উল্লেখ না থাকিলে বিলটি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা যাইবে না;

(আ) সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত না হইলে অনুরূপ কোন বিলে সম্মতিদানের জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইবে না;

(খ) উপরি-উক্ত উপায়ে কোন বিল গৃহীত হইবার পর সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট তাহা উপস্থাপিত হইলে উপস্থাপনের সাত দিনের মধ্যে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিবেন, এবং তিনি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।[৭]

সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদ বিশ্লেষণ করলে সংবিধান সংশোধন প্রক্রিয়ার জন্য চারটি ধাপ/শর্ত অবশ্যই পালন করতে হয়। প্রথমত, সংবিধান সংশোধনরে জন্য আনীত বিলের পূর্ণাঙ্গ শিরোনাম এবং শিরোনামে সংবিধানের যে যে বিধান সংশোধন করা হবে তা স্পষ্ট রূপে উল্লেখ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, বিলটি সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে গৃহীত হতে হবে। তৃতীয়ত, সংসদে গৃহীত বিলটি রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠাতে হবে এবং রাষ্ট্রপতি সাত দিনের মধ্যে তাতে সম্মতি দান করবেন। যদি এই সময়ের মধ্যে কোন কারণে সম্মতি দানে অসমর্থ হয়ে থাকে তাহলে উক্ত সময় শেষে তিনি সম্মতি দান করেছেন বলে গণ্য হবে। চতুর্থত, সংবিধানের প্রস্তাবনা, রাষ্ট্রীয় মূলনীতি, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও তাঁর ক্ষমতা এবং প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার সদস্য নিয়োগের বিধান প্রভৃতি সংশোধন করতে বিলটি রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরিত হলে তিনি তাতে সম্মতি দিবেন কিনা এই প্রশ্নে গণভোটের আয়োজন করতে হবে। উল্লেখ্য, গণভোট আয়োজনের বিধান সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাতিল করা হয়।[৮] এই সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা মধ্য দিয়ে জাতীয় সংসদে সংবিধান সংশোধনীর একটি বিল পাশ হয়ে নতুন সংশোধনীতে পরিণত হয়। সংবিধান সংশোধনীর এই প্রক্রিয়া দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্য হওয়ায় বাংলাদেশের সংবিধানকে দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান বলা হয়।

পঞ্চদশ সংশোধনীর প্রেক্ষাপট

যে মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর কাছে লাখ লাখ নিরীহ মানুষ প্রাণ দিয়েছে এবং লাখ লাখ নারী তাদের সতীত্বকে বিসর্জন দিয়েছে তার বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ ছিলো ১৯৭২ সালের সংবিধান প্রণয়ন। সেই সংবিধানের মৌলিক চেতনা ছিলো একটি ধর্মনিরপেক্ষ এবং উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা যা স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম সাড়ে তিন বছর ঠিক থাকলেও পরবর্তীতে তার উপর বহুবার আঘাত এসেছে। সংবিধানের মৌলিক চেতনা বিরোধী প্রথম আঘাত হলো চতুর্থ সংশোধনী যার সুযোগ নিয়ে সামরিক স্বৈরশাসক এবং নাগরিক ক্ষমতা হরণকারীরা রাজনীতিকে ভিন্ন পথে প্রবাহিত করে।

১৯৭৫ পরবর্তী জিয়াউর রহমান ও এরশাদ সরকার সংবিধানকে করেছিলো ধর্মীয় রাজনীতির উর্বর ভূমি। সংবিধানের চারটি মূলনীতি থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদকে বাতিল করে দেয়। এরপরে আবার ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাহাত্তরের সংবিধান থেকে বহুদূরে চলে যায়। এছাড়া সংবিধানে সংযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি নিয়ে সমালোচনার চূড়ান্তরূপ পরিলক্ষিত হয় ২০০৬ সালের সেনা সমার্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রাজনীতি বিরোধী কর্মকান্ডে, যার কারণে এই পদ্ধতিকে বাতিল করার প্রশ্নটিও সামনে চলে আসে।

উচ্চ আদালত কর্তৃক পঞ্চম সংশোধনী বাতিল হবার পরে ১৯৭২ সালের সংবিধানে ফিরে যাবার বিষয়টি আবার আলোচনায় আসে। কেননা ১৯৭২ সালের সংবিধান রচিত হয়েছিলো মুক্তিযুদ্ধের মহান আদর্শকে বাস্তবায়নের জন্য যেখানে ধর্মের সাথে কোন সংঘাত ছিলো না। যেখানে ছিলো বাঙালির ইতিহাস-ঐতিহ্যের সংরক্ষণ, উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রচলন। সংবিধানের মূলনীতি- জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে

আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক দর্শন একই হওয়ায় ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে সংবিধান সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর লক্ষ্যে ২১ জুলাই, ২০১০ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সংসদ সদস্যের সমন্বয়ে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট 'বিশেষ কমিটি' গঠন করা হয়। সরকারের আমন্ত্রণ সত্ত্বেও কমিটিতে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি থেকে কোন প্রতিনিধি প্রেরণ করেনি। বিশেষ কমিটি দীর্ঘ ১১ মাস বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংগঠন ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, আইন বিশেষজ্ঞ, সংবিধান বিশেষজ্ঞসহ বিশিষ্ট জনদের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ৫১ দফা সুপারিশসহ সংশোধনী রিপোর্ট ৮ জুন, ২০১১ জাতীয় সংসদে পেশ করে। যা ২৫ জুন, ২০১১ আইনমন্ত্রী বিল আকারে সংসদ অধিবেশনে উপস্থাপন করেন এবং বিলের উপর আলোচনা শেষে ৩০ জুন সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বিলটি সংসদে গৃহীত হয়।[৯]

পঞ্চদশ সংশোধনী পাসের প্রক্রিয়া

বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী আনার লক্ষ্যে ২১ জুলাই, ২০১১ 'সংবিধান সংশোধন বিশেষ কমিটি' গঠন করা হয়। সংবিধান সংশোধনের বিশেষ কমিটি ৫ জুন, ২০১১ পর্যন্ত মোট ২৭ টি বৈঠকে মিলিত হয়ে সংশোধনের প্রয়োজনীয় কাজ করে ও সিদ্ধান্ত নেন। এছাড়াও বিশেষ কমিটি বেশ কয়েকবার সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে বিশেষ বৈঠকে মিলিত হয়। পঞ্চদশ সংশোধনীকে সুন্দর ও সঠিকভাবে করতে বিশেষ কমিটি কতিপয় বিশেষ আনুষ্ঠানিক বৈঠকে বসেন যার মধ্যে রয়েছে- ২০১১ সালের ২৪ এপ্রিল কয়েকজন সাবেক প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি ও সংবিধান বিশেষজ্ঞের সাথে বৈঠক; ২৫ এপ্রিল সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী মহাজোটের শরিক দলগুলোর সাথে এবং প্রধান বিরোধী দল বিএনপি-র সাথে বৈঠক, যদিও বিএনপি বৈঠকে যোগ দেয়নি; ২৭ এপ্রিল ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সাথে বৈঠক; ৩ মে বুদ্ধিজীবী ও সুশীল সমাজের সাথে বৈঠক; ৪ মে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সম্পাদকদের সাথে বৈঠক এবং সর্বশেষ ২৬ মে সেক্টর কমান্ডার্স ফোরামের সাথে বৈঠক করে।[১০] সকল বৈঠক শেষে ৮ জুন, ২০১১ বিশেষ কমিটি ৫১ দফা সুপারিশসহ পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধনী রিপোর্ট জাতীয় সংসদে পেশ করে। যা ২৫ জুন আইনমন্ত্রী বিল আকারে জাতীয় সংসদের অধিবেশনে উপস্থাপন করেন এবং বিলের উপর আলোচনা শেষে ৩০ জুন, ২০১১ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বিলটি সংসদে গৃহীত হয়।

পঞ্চদশ সংশোধনীর বিষয়বস্তু

৩০ জুন, ২০১১ জাতীয় সংসদে পাশ হওয়া পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের কতিপয় মৌলিক কাঠামোতে পরিবর্তন আনা হয়। পরিবর্তনসমূহের[১১] মধ্যে রয়েছে–

১. সংবিধানের প্রস্তাবনা, অনুচ্ছেদ ৮, ১৯, ২৫, ৪২, ৪৭, ৬৫, ৬৬, ৭২, ৮০, ৮২, ৮৮, ৯৩, ১১৭, ১১৮, ১২২, ১২৩, ১২৫, ১২৯, ১৩৯, ১৪১ক, ১৪৭, ১৫২ এবং তফসিল ১ম, ৩য় ও ৪র্থ-তে সংশোধন করা হয়।
২. এই সংশোধনীতে অনুচ্ছেদ ২ক, ৪ক, ৬, ৯, ১০, ১২, ৩৮, ৪৪, ৬১, ৭০ এবং ৬ষ্ঠ ভাগের প্রথম অধ্যায়ে ১১৬, ১৪২, ১৪৫ক, ১৫০ সংবিধানে পুনস্থাপন করা হয়।
৩. সংবিধানে অনুচ্ছেদ ৭ক, ৭খ, ১৮ক, ২৩ক এবং নতুন তিনটি (৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম) তফসিল সংযুক্ত করা হয়।
৪. সংশোধনীতে অনুচ্ছেদ ৫৮ক, অধ্যায় ২ক তত্ত্বাবধায়ক সরকার, ৬ষ্ঠ-ক ভাগ এবং একাদশ সংশোধনীকেও বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়।

পঞ্চদশ সংশোধনী বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এই সংশোধনীর যে বৈশিষ্ট্যসমূহ[১২] পরিলক্ষিত হয় সংক্ষেপে তা হলো–

১. ১৯৭২ সালের সংবিধানে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার চারটি মূল মৌলিক রাষ্ট্রীয় নীতি পুর্নবহাল করা হয়।
২. অনুচ্ছেদ ৭-এর মধ্যে সংবিধান বহির্ভূত উপায়ে ক্ষমতা দখল শেষ করার জন্য ৭(ক) এবং ৭(খ) অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত করে সংবিধানের মৌলিক বিধানগুলিকে 'অসংশোধনযোগ্য' ঘোষণা করা হয়। অসাংবিধানিক পন্থায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলকারীদের রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করার এবং শাস্তি হিসেবে সর্বোচ্চ দন্ডের বিধান রাখার প্রস্তাব করা হয়।
৩. পরিবেশ ও জীববৈচিত্র রক্ষা ও উন্নতির জন্য অতিরিক্ত বিধান।
৪. উপজাতি, নৃতাত্ত্বিক সম্প্রদায় এবং ছোট জাতিদের সংস্কৃতি রক্ষার জন্য বিধান যুক্ত করা হয়।
৫. বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসাবে বাঙালি এবং নাগরিক হিসাবে বাংলাদেশী বলে পরিচিত করা হয়।
৬. সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রবর্তিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করা হয়।
৭. শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান এবং তাঁর প্রতিকৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শন।
৮. সংবিধান থেকে গণভোট ব্যবস্থা বাতিল।
৯. সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা বর্তমান ৪৫ থেকে ৫০টিতে উন্নীত করা।
১০. একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধে সাজাপ্রাপ্তদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ অবৈধ ঘোষণা।
১১. জরুরি অবস্থা ১২০ দিনের বেশি চলতে না পারার বিধান।
১২. সংবিধানের মূল ৭০ অনুচ্ছেদ পুর্নবহাল করা হয়।
১৩. মূল ৯৫ অনুচ্ছেদ পুনর্বহাল করে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি নিয়োগের বিধান করা হয়।
১৪. সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল গঠনের বিধান রাখা হয়।

১৫. নির্বাচন কমিশনের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়।
১৬. মেয়াদ অবসানের কারণে সংসদ ভেঙ্গে গেলে পূর্ববর্তী ৯০ দিনের মধ্যে এবং অন্য কোন কারণে সংসদ ভেঙ্গে গেলে পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে সংসদ নির্বাচনের বিধান করা হয়।
১৭. সংবিধান প্রবর্তনকালে চতুর্থ তফসিলে যা ছিলো তা বহাল রেখে পরবর্তীতে সামরিক সরকার কর্তৃক জারীকৃত সকল কিছু যা ঐ তফসিলে যুক্ত হয়েছিলো তা বাতিল করা হয়।
১৮. ৭ই মার্চের ভাষণ, ২৬ মার্চে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা এবং ১০ এপ্রিল জারীকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র সংবিধানের ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম তফসিলের মাধ্যমে অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

পঞ্চদশ সংশোধনীর পর্যালোচনা

বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে পঞ্চদশ সংশোধনী একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৭২ সালে প্রণীত প্রথম সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমূহ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়। যদিও সময়ের আবর্তে ইতোপূর্বে সংবিধানে অনেক সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিয়োজন করা হয়েছে। যার কারণে এখন চাইলেও পুরোপুরি ১৯৭২ এর সংবিধানে ফেরত যাবার সুযোগ নেই। তারপরেও পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের তুলনামূলক একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে।

পঞ্চদশ সংশোধনী সংসদে পাশ হবার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংসদে বলেন, এ সংশোধনীর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও নীতি রক্ষা করার সুযোগ হয়েছে। দেশের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছে এবং বেআইনিভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পথ বন্ধ করেছে। একই সঙ্গে কারা ক্ষমতায় যাবে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা জনগণকে দেয়া হয়েছে। তিনি আরো বলেন, সুপ্রিম কোর্ট দেশের সংবিধান লঙ্ঘন করে সামরিক আইন জারি করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলকে অবৈধ ঘোষণা করেছে এবং এতে দেশের জনগণের ভোট ও গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত হয়েছে। সর্বোচ্চ আদালতের রায় এবং বাস্তবতার প্রেক্ষিতে সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনী এনে দেশের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছি। এই গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য হলো জনগণের ক্ষমতাকে শক্তিশালী করা এবং কে ক্ষমতায় যাবে বা যাবে না, তা সিদ্ধান্ত নিতে জনগণের ক্ষমতায়ন করা।[১৩]

পঞ্চদশ সংশোধনীর পর অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, মুনতাসীর মামুন ও শাহরিয়ার কবির এক বিবৃতিতে বলেন, ভোটের কথা ভেবে সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ও বিসমিল্লাহ বহাল রাখার পরিণতি খারাপ হতে পারে। মোটকথা, এই সংশোধনীর মাধ্যমে শেখ হাসিনার সরকার ডান-বাম, ধর্মভিত্তিক-ধর্মনিরপেক্ষ সকল পক্ষকে খুশি রাখার চেষ্টা করেছেন।[১৪]

সংবিধান বিশেষজ্ঞরা পঞ্চদশ সংশোধনীর সাংবিধানিকতা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন। তারা বলেন, সংবিধানের মৌলিক কাঠামো জনগণের সম্মতি ছাড়া সংশোধন অনভিপ্রেত, কেননা বাংলাদেশের সংবিধান এ দেশের জনগণের উইল বা ইচ্ছার অভিব্যক্তি। মৌলিক কাঠামো সংশোধন করতে গণভোটের আয়োজন করার বিধান সংবিধানে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তা পাশ কাটিয়ে পঞ্চদশ সংশোধনী পাশ করা হয়। শুধু তাই নয়, সংবিধান থেকে গণভোটের বিধানটিও এই সংশোধনীর মাধ্যমে বাতিল করা হয়। এছাড়াও বিশেষজ্ঞরা বলেন, গণতান্ত্রিক চর্চায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূল ভিত্তি হলো আলাপ-আলোচনা এবং ঐকমত্য। কিন্তু পঞ্চদশ সংশোধনী পাশের ক্ষেত্রে সংসদে কিংবা ও সংসদের বাইরে কোথায়ও সত্যিকারার্থেই কোনোরূপ সুচিন্তিত বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়নি এবং বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে সরকারি দল তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে সংশোধনী পাশ করিয়ে নেয়।[১৫]

পঞ্চদশ সংশোধনী নিয়ে ইতিবাচক-নেতিবাচক উভয় সমালোচনা রয়েছে। এই সংশোধনীতে বঙ্গবন্ধুকে 'জাতির পিতা'র স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, স্পিকার ও প্রধান বিচারপতির দপ্তরসহ দেশের বিভিন্ন সরকারি, আধা-সরকারি স্বায়ত্বশাসিত ও সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতির প্রতিকৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের বিধান অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এছাড়া জাতির পিতার ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণ, ২৫ মার্চের মধ্যরাতের পর বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা এবং ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠকে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এগুলো প্রসংশার দাবী রাখে তেমনি সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদের পরে ৭ক ও ৭খ নতুন করে সংযোজন করে বিতর্কেও সৃষ্টি করেছে। কেননা ৭ক অনুচ্ছেদের মাধ্যমে সংবিধানের প্রায় এক-তৃতীয়াংশকে অসংশোধনযোগ্য করার ফলে এগুলো মৌলিক কাঠামোর মর্যাদা পায়। আর সংবিধানের মৌলিক কাঠামো শুধুমাত্র গণপরিষদ সংশোধন করতে পারে, কোন সংসদের এখতিয়ারভুক্ত নয়। এভাবে মৌলিক কাঠামোর সম্প্রসারণ সংবিধানের মৌলিক কাঠামো তত্ত্বেরই লঙ্ঘন। এ বিষয়ে সংবিধান বিশেষজ্ঞরা বলেন, এক সংসদ আরেক সংসদের হাত-পা বেঁধে দিতে পারে না, কারণ সংবিধান সংশোধন সংসদের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। আবার সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনীর জন্য গণভোটের বিধানও বাতিল করা হয়েছে, অথচ পশ্চিমা তথা গণতান্ত্রিকভাবে উন্নত দেশগুলোতে গণভোটের বিধান আরো জনপ্রিয় হচ্ছে।[১৬]

পঞ্চদশ সংশোধনীতে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদকে আরো জটিল করা হয়েছে। সংশোধনীর মাধ্যমে স্বতন্ত্র বিজয়ী প্রার্থীরা কোন দলে যোগ দিলে সংসদে ঐ দলের বিপক্ষে ভোট দিলে বা বিরত থাকলে সংসদ সদস্য পদ হারাবে। [১৭]

পঞ্চদশ সংশোধনীতে আরেকটি বড় বির্তকের তৈরি হয় 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি' বাতিল করায়। আদালত কর্তৃক ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিলের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা অবৈধ ঘোষণা করে দেয়া রায় নিয়ে নানান মতপার্থক্য রয়েছে। আদালত সংক্ষিপ্ত আদেশে ঘোষণা করে তা

পরবর্তী দুই মেয়াদের জন্য রাখার পক্ষে মত দেয়। যার সমালোচনায় মাহমুদুল আসলাম বলেন, 'একটি নিন্দিত ব্যবস্থাকে আগামী দুই সংসদ নির্বাচনের জন্য জিয়ে রেখে আপিল বিভাগ বিচারিক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে আইনসভার সংবিধান প্রদত্ত দায়িত্ব পালনের ওপর হস্তক্ষেপ করেছেন, যা সুপ্রতিষ্ঠিত সাংবিধানিক আইনশাস্ত্র, আইনের শাসন ও ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতির পরিপন্থি।' এছাড়াও বিচারপতি খায়রুল হক তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার অধীনে দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংসদীয় অনুমোদনের শর্ত জুড়ে দিয়ে তার চূড়ান্ত রায়কে পরিবর্তন করেছেন, যা বিচারপতি আব্দুল মতিনের ভাষায় 'আদালতের সাথে জালিয়াতি' এবং পেশাগত আচরণবিধি লঙ্ঘনের সমতুল্য। এমন পরিস্থিতিতে সংসদীয় কমিটি কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা রেখেই সংবিধান সংশোধনের সর্বসম্মত প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর বদলে যাওয়া নিঃসন্দেহে সংবিধানের ক্ষমতা পৃথকীকরণের নীতির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।[১৮]

তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতির ইতিহাস দেখলে দেখা যায় ১৯৯৬ সালে যাদের তুমুল আন্দোলনে পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থা হিসাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি চালু করা হয়েছিলো তারাই আবার সেই ব্যবস্থার বিরোধীতা করে সংবিধান থেকে বাতিল করে দেয়। সেই সময়ে ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকার প্রধান বেগম খালেদা জিয়া বলেছিলেন, একমাত্র পাগল আর শিশু ছাড়া কেউই নিরপেক্ষ নয়। কিন্তু পঞ্চদশ সংশোধনীতে এই পদ্ধতি বাতিল করা হলে তারাই আবার তা পুনর্বহালের জন্য আন্দোলনের ডাক দেয়। অন্যদিকে উচ্চ আদালত ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল করলেও সংসদ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পরবর্তী দশম ও একদশ জাতীয় নির্বাচনের জন্য বহাল রাখতে পারে বলে মত দেয়। তবে সে ক্ষেত্রে বিচারকদের সেই পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত না করার পক্ষে মত দেয়। শেষ পর্যন্ত পঞ্চদশ সংশোধনী এই ব্যবস্থা বাতিল করে দেয়।[১৯]

মোটকথা, পঞ্চদশ সংশোধনী বাংলাদেশের সাংবিধানিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্ব বহন করে। এই সংশোধনীর মাধ্যমে যেমন বাহাত্তরের বৈশিষ্ট্য অনেকটা ফিরে এসেছে তেমনি অনেক অন্তর্দ্বন্দ্বও তৈরি করেছে। সর্বোপরি, সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

উপসংহার

সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বেশি সমালোচিত হয়। এই সংশোধনীতে বিচারপতিদের অবসর গ্রহণের বয়স ৬৫ থেকে বাড়িয়ে ৬৭ বছর করা হয়। ধারণা করা হয় ক্ষমতাসীন চারদলীয় জোট সরকার তাদের পছন্দের ব্যক্তিকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করতেই এই সংশোধনী এনে ক্ষমতা রক্ষার একটি কৌশল অবলম্বন করেছে। ফলে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৪ দলের আন্দোলনে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে। আন্দোলনের এক পর্যায়ে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় এসে সংবিধানের সকল নিয়ম ভেঙ্গে দুই বছর ক্ষমতায় থেকে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার গঠন করে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি বাতিলসহ সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ বিধানাবলীতে পরিবর্তন এনে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী জাতীয় সংসদে পাশ করে। সংশোধনীর আলোচনায় সংসদে বলা হয় বাহাত্তরের সংবিধানের মূল চেতনায় ফেরত যেতেই এই সংশোধনী আনা হয়।

সংবিধান বিশেষজ্ঞদের মতে পঞ্চদশ সংশোধনীতে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিকই রয়েছে। এখানে যেমন পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষা, জাতিগত সংখ্যালঘুদের অগ্রাধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন, ধর্মনিরপেক্ষতা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল ইত্যাদি যেমন সংবিধানকে উন্নত করেছে তেমনি সংবিধানের ৭খ অনুচ্ছেদ, সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, 'দ্বিতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, নবম-ক ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সাপেক্ষে তৃতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ এবং একাদশ ভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমুহের বিধানাবলী সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোন পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হইবে' সংযোজনের মাধ্যমে ভবিষ্যতে সংসদের সংবিধান সংশোধন করার ক্ষমতা সীমিত করে দিয়েছে যা বিধি সম্মত নয়। কেননা কোন সংসদ আইনের দ্বারা পরবর্তী সংসদের কাজের সীমা নির্ধারন করে দিতে পারেনা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকার সকল পক্ষকে খুশি রাখতে চেয়েছেন। তারা সংবিধানে বিএনপি'র জন্য 'বিসমিল্লাহ', জাতীয় পার্টির জন্য 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম', সংবিধানের মূলনীতিতে বামপন্থীদের জন্য 'সমাজতন্ত্র' এবং অমুসলিমদের জন্য 'ধর্মনিরপেক্ষতা' রেখে বাহাত্তরের সংবিধান ফিরিয়ে এনেছে। পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের একটা সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য সমাধান করার সুযোগ হয়েছিলো, কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যকার অবিশ্বাস, পারস্পরিক আস্থার অভাব, আদর্শগত পার্থক্য, ব্যক্তি ও দলগত রাজনৈতিক ইতিহাস প্রভৃতি একই সাথে রাষ্ট্রধর্ম বিষয়ে জনসাধারণের বিচক্ষণতার অভাবে তা আর হয়ে উঠেনি।

তথ্যসূত্র

১ Halim, Md. Abdul, (2014) *Constitution, Constitutional Law and Politics: Bangladesh Perspective*, Dhaka, CCB Foundation, P. 24

২ বেগম, ফিরোজা, (২০০৩) *রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচিতি*, ঢাকা: এঞ্জেল প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স, পৃ. ৪৩৯

৩ Agarwal, R. C., 2004, *Political Theory*, New Delhi, S. Chand and Company LTD, P. 316

৪ *Constitution*, (Online) https://en.wikipedia.org/wiki/Constitution

[৫] Ahmed, Shahabuddin, - *On Bangladesh Constitutional 8th Amendment Case,* (Online) https://www.academia.edu/7000979/On_Bangladesh_Constitutional_8th_Amendment_Case

[৬] বিস্তারিত Halim, Md. Abdul, (2014) *Constitution, Constitutional Law and Politics: Bangladesh Perspective*, Dhaka, CCB Foundation, P. 57-60 এবং ইকবাল, কাজী জাহেদ, (২০১৬) *বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন ১৯৭২-১৯৮৮ প্রেক্ষাপট ও পর্যালোচনা*, ঢাকা, ধ্রুবপদ, পৃ. ১৮-২৫

[৭] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ১৪২

[৮] বিস্তারিত রশিদ, হারুন-অর- (২০১৮) *বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০১৮*, ঢাকা, অন্যপ্রকাশ, পৃ. ২৮৫-২৮৬; হক, আবুল ফজল (২০০৭) *বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি*, ঢাকা, অনন্যা, পৃ. ৩৯২-২৯৩ এবং খান, আরিফ (২০১৫) *বাংলাদেশের সংবিধান*, ঢাকা, বেঙ্গল ল বুকস, পৃ. ২৫৯-২৬০

[৯] হক, আবুল ফজল (২০১৮) *বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি*, ঢাকা, অনন্যা প্রকাশ, পৃ. ২৭১

[১০] রশীদ, আমীন আল (২০১১) *সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী: আলোচনা-তর্ক-বিতর্ক*, ঢাকা, ঐতিহ্য, পৃ. ১৭

[১১] হালিম, মোঃ আব্দুল (২০২৩) (দ্বাবিংশ সংস্করণ), *সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি: বাংলাদেশ প্রসঙ্গ*, ঢাকা, বীকন পাবলিকেশন্স, পৃ. ১৫০

[১২] Ahmed, Nazir, - Legitimacy and legality of the Fifteenth Amendment of the Constitution of Bangladesh, (Online) http://www.parisvisionnews.com/bangladesh-news/96-political-news/9476-fifteenth-amendment-of-the-constitution-of-bangladesh.html

[১৩] বিবিসি বাংলা, *অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল বন্ধ করেছে সংবিধানের ১৫তম সংশোধনী*, (অনলাইন) https://www.voabangla.com/a/6941343.html

[১৪] হক, আবুল ফজল (২০০৭) *বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি*, ঢাকা, অনন্যা প্রকাশ, পৃ. ২৭৩; রশীদ, আমীন আল (২০১১) *সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী আলোচনা-তর্ক-বিতর্ক*, ঢাকা, ঐতিহ্য, পৃ. ১৪৪

[১৫] মজুমদার, বদিউল আলম, *পঞ্চদশ-সংশোধনী-ও-সাংবিধানিকতা-নিয়ে-কিছু-গুরুত্বপূর্ণ-প্রশ্ন* (অনলাইন) https://www.jugantor.com/todays-paper/sub-editorial/681454/

[১৬] Ahmed, Nazir, - Legitimacy and legality of the Fifteenth Amendment of the Constitution of Bangladesh, (Online) http://www.parisvisionnews.com/bangladesh-news/96-political-news/9476-fifteenth-amendment-of-the-constitution-of-bangladesh.html

[১৭] ফিরোজ, জালাল ও আহমেদ, সাব্বীর (সম্পাদিত), (২০২৩) *সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ পক্ষে বিপক্ষে*, ঢাকা: সেন্টার ফর পার্লামেন্টারি স্টাডিজ, পৃ. ৪৮

[১৮] মজুমদার, বদিউল আলম, *পঞ্চদশ-সংশোধনী-ও-সাংবিধানিকতা-নিয়ে-কিছু-গুরুত্বপূর্ণ-প্রশ্ন* (অনলাইন) https://www.jugantor.com/todays-paper/sub-editorial/681454/

[১৯] উদ্দিন, মোহাম্মাদ বখতিয়ার (২০১৪) *বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী: প্রক্রিয়া, বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য*, **সমাজ নিরীক্ষণ**, নং-১২৮, জানুয়ারি-মার্চ, পৃ. ১০৭

[Manuscript received on 30 november,2023; accepted on 15 January, 2024]